বর্ত্তমান

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

বর্ত্তমান

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মেডিকেল লাইব্রেরী।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

কলিকাতা——হেয়ার প্রেসে

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তের দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

বর্ত্তমান

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি।

অগ্রে সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

পৃথিবীতে যদি একটীমাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে বাক্‌শক্তি হীন হইত। বাক্‌শক্তি থাকিলেও, বোধ হয় তাহাকে তাহা ব্যবহার করিতে হইত না। মনুষ্যের সংখ্যা একাধিক বলিয়াই তাহাদিগকে কথা কহিতে হয়। অন্যকে আপন আপন অভিপ্রায়াদি জ্ঞাপন করিবার জন্যই লোকে কথা কয়। লোকে লেখেও সাধারণতঃ সেই জন্য।

যাহার অন্যকে কিছুই বলিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নাই সে লিখিবে কেন? সে মনের কথা মনেই রাখিয়া দিবে। মনের কথা বিস্মৃত হইবার ভয়ে যদিও লেখে, তাহা হইলে যাহা লিখিবে তাহা আপনার কাছেই রাখিয়া দিবে, অন্যকে পড়িতে দিবে না। সে যদি পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় বা বিতরণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অভিপ্রায়, অন্যে তাহার পুস্তকাদি পাঠ করে। দার্শনিক বল, কবি বল, ইতিহাসবেত্তা বল, বৈজ্ঞানিক বল, সকলেরই সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরে যাহা পড়িবে, তাহাতে এমন কিছুই থাকা উচিত নহে, যদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অপরের অনিষ্ট করিবার অধিকার কাহারই নাই—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি, নাটককার, উপন্যাসকার, কাহারই নাই। অপরকে যদি কিছু পড়িতে দিতে হয়, তবে তাহা এরূপ প্রকৃতির হওয়া উচিত ও আবশ্যক যে, তাহা পড়িয়া অপরের অপকার না হইয়া উপকারই হয়। অতএব অপরে যাহা পড়িবে, অপরের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লেখা

কর্ত্তব্য। কেবল আপন মনের আবেগের বশবর্ত্তী হইযা অথবা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লেখা অন্যায ও অবিধেয। স্বভাব চরিত্রের বিভিন্নতা বশতঃ মনের আবেগ ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, তৃপ্তিসাধন, ভাল কথা লিখিযাও হইতে পারে, মন্দ কথা লিখিযাও হইতে পারে। সুতরাং লোকের কেবল মনের আবেগে লিখিবার বা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লিখিবার অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করিলে, অতি জঘন্য এবং সমাজের বিষম অনিষ্টকর লেখা সম্বন্ধেও কোন আপত্তি করিতে পারা যায না। কিন্তু আপত্তি যে হইতে পারে বা হওযা কর্ত্তব্য, রাজবিধানে অশ্লীল লেখার দণ্ডের ব্যবস্থাতেই তাহার প্রমাণ রহিযাছে। যে সাহিত্যে বা সাহিত্যের যে সকল অংশে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয, অথবা লোক মধ্যে কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি, কুৎসাপ্রিযতা, ঁ ত্য, অসারতা, আড়ম্বর প্রিযতা, কপটতা প্রভৃতি অসদ্গুণের সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি সাধন করে, তাহা সাহিত্য নামের অযোগ্য, সাহিত্য নামে তাহা অভিহিতই হইতে পারে না। আবার যদ্দারা লোকের উপকার সাধন করিতে

হয় তদ্দ্বারা যত অধিক পরিমাণে এবং যত অধিক লোকের উপকার সাধিত হয় ততই ভাল, তাহার সার্থকতা ততই বেশী হয়। সাহিত্য হইতে উপকারের পরিমাণ যত বেশী হয় এবং যত অধিক লোকের উপকার হয়, উহার সার্থকতারও তত বৃদ্ধি হয়, উহা সাহিত্য নামেরও তত যোগ্য হয়। লোক মধ্যে সাহিত্য যত সুশিক্ষা প্রচার করিবে এবং সদিচ্ছা, সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌ভাবের উদ্রেক করিবে, উহার উদ্দেশ্য তত সিদ্ধ হইবে, উহার প্রকৃতি তত উন্নত হইবে। সুশিক্ষিত, সুনীতিপরায়ণ, সচ্চরিত্র, সদাশয়, উদারহৃদয় সেবক পাইলেই সাহিত্যের এইরূপ সিদ্ধি ও উন্নতি হয়। আর সাহিত্যের দ্বারা অধিক লোকের অর্থাৎ সমাজের উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে লোকসাধারণের উপকার সাধন করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীদিগকে এমন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে হয়, সাহিত্যে এমন ভাষার ব্যবহার করিতে হয় যে, উহা লোক সাধারণের যতদূর সম্ভব বোধগম্য ও আয়ত্ত হয়। যাহা সকলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সকলে বুঝিতে পারে এরূপ সরল, সহজ, স্থানীয়-বিশেষত্ব বর্জ্জিত ভাষায় তাহা লিখিত হওয়া

কর্ত্তব্য। তাহলে তদ্দারা অধিক লোকের উপকার সাধিত হয় না। দর্শন বা বিজ্ঞানের উচ্চতম অংশ বা তদ্রূপ বিষয় সকল লোক সাধারণের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না বটে এবং সেই জন্য সচরাচর এমন কঠিন ভাষায় ও দুরূহ প্রণালীতে লিখিত হয় যে, ঐ সকলের অধ্যয়ন প্রায়ই এক এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু চেষ্টা করিলে ঐ সকল বিষয়ও এমন ভাষায় লিখিতে পারা যায় যে এখনকার অপেক্ষা অধিক লোকে উহাদের অধ্যয়ন ও আলোচনায় নিযুক্ত হইতে পারে। দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থাদির ভাষা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সাধারণের উপযোগী ও বোধগম্য করা হইতেছে। অবশ্য পরিভাষার কথা স্বতন্ত্র।

কোন জাতির মধ্যে সাহিত্য লোকসাধারণের যত উপযোগী হয় উহা ততই জাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতে থাকে এবং যাহাদিগকে লইয়া সেই জাতি তাঁহাদেরও মনে এক জাতীয়তার ভাব তত উদ্রিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের

সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় মহৎ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র কার্য্য করিতে পারা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নহে। সুপ্রণালীতে রচিত হইলে, উহা জাতি গড়িবার কার্য্যে যেমন সহায়তা করে, কুপ্রণালীতে রচিত হইলে, জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে তেমনই কার্য্যকর হয়, জাতি গঠনের তেমনই প্রতিবন্ধকতা করে। গঠনের গুণে সাহিত্য যেমন সুন্দর, যেমন অমৃতময় ফল প্রসব করে, গঠনের দোষে তেমনই কদর্য্য, তেমনই বিষময় ফল প্রদান করে। যে সাহিত্যের ফল কদর্য্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা জাতি গড়িতে দেয় না, তাহা জাতীয় সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে। এইবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যখন ৺ গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের স্কুলের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি আমাদের পাঠ্য ছিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা লেখার বড়ই প্রশংসা শুনিতাম। এখনও যে না শুনি তাহা

নহে। কিন্তু এখন তিনি যেন একটু চাপা পড়িয়াছেন, তাঁহার লেখা কিছু পুরাতন প্রণালীর বলিযা এখন বিবেচিত হয, বোধ হয আব বড় পঠিতও হয না। তিনি লিখিতে আবম্ভ কবিবাব কিছু দিন পবে তাঁহা হইতে এক ভিন্ন শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালা লিখিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রায সকলেই ইংবাজীওযালা, সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অথবা অল্পই অভিজ্ঞ। তাঁহাদেব লেখা পড়িযা অনেকে তখন বলিতেন যে 'বাঙ্গালা ভাষাটা বেওযাবিস্ ভাষা'। বোধ হয কথা-টাব অর্থ এই যে, কোন সম্পত্তিব ওযাবিস্ বা উত্তবা-ধিকাবী না থাকিলে, লোকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত উহাব বে-আইনী ভোগ দখল কবিযা থাকে, নব্য লেখকেবা তেমনই ব্যাকবণজ্ঞানেব অভাবে ব্যাকিরণদুষ্ট লেখা লিখিযা থাকেন। প্রধানতঃ ব্যাক-রণদোষেব প্রতি লক্ষ্য কবিযাই যে লোকে ঐ কথা বলিতেন, তখনকার প্রধান প্রধান নব্যলেখকদিগের গ্রন্থেব সমালোচনা পড়িলে তাহাই প্রতীতি হয। সে সকল সমালোচনায অন্য দোষ অপেক্ষা ব্যাকরণ দোষেবই বেশী আলোচনা থাকিত এবং ঐরূপ দোষ লইযাই বেশী ঠাট্টা বিদ্রূপ গালাগালি কবা হইত।

যে শ্রেণীর লোকে নব্য লেখকদিগকে ব্যাকরণে মূর্খ বলিয়া গালি দিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকে বেঙ্গোবিস্‌ ভাষা বলিতেন, সে শ্রেণীর লোক এখনও আছেন—তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রাচীন পণ্ডিত শ্রেণীর লোক। এক সময়ে মনে হইয়াছিল তাঁহারাই নূতন বাঙ্গালা ভাষা গঠিত করিবেন এবং নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে। তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতিকে দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য হইয়াও হয় নাই। তাঁহারা জীবিত থাকিতে থাকিতেই নব্য লেখকেরা সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হন। প্রাচীনেরা তাঁহাদিগকে ব্যাকরণে মূর্খ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। দুই চারি জন অনধিকারী, শুদ্ধ অসূয়া পরবশ হইয়া, সে ঘোষণারও ঘোষণা করিল। লোকে কিন্তু সে ঘোষণাও শুনিল না, সে ঘোষণার ঘোষণাও শুনিল না। নব্য লেখকেরা সংখ্যায় প্রবল হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পাঠকের সংখ্যাও প্রবল হইতে লাগিল। এখন নব্য লেখকদিগেরই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক

প্রকার একাধিপত্য। প্রাচীন শ্রেণীর লেখক যে একেবারে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা যেন এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অনেক স্থলে নব্যদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া নব্যদিগের অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষাটা বেওয়ারিস্ ভাষা'—এই কারণে এই কথাটা এখন আর বড় শুনা যায় না। শুনা যায় না বটে ; কিন্তু বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে ঐ কথাটা তখনকার অপেক্ষা এখনই বেশী খাটে। কারণ এখনকার বাঙ্গালায় তখনকার ন্যায় ব্যাকরণ দোষ ত আছেই ; তদ্ব্যতীত অন্য রকমের এমন অনেক দোষ দৃষ্ট হয়, যাহা তখনকার লেখায় দৃষ্ট হইত না অথবা অল্পই দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত দোষের মূল মানসিক অসারতা এবং চরিত্রের দুর্ব্বলতা। তখনও আমাদের মানসিক অসারতা ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা ছিল, সুতরাং তখনকার লেখাতেও এই সকল দোষ থাকিত। কিন্তু এখন বোধ হয় আমাদের মানসিক অসারতা ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা বাড়িয়াছে, নহিলে এখনকার লেখায় ঐ সকল দোষ তখনকার অপেক্ষা এত অধিক দৃষ্ট হয় কেন ? স্বদেশানুরাগ, স্বজন-

প্রিয়তা, প্রীতি, ভক্তি, দযা, পবোপকারপ্রিযতা প্রভৃতি মানবহৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকল আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের লেখা পড়িলে অপরে মনে করিতে পাবে যে, আমাদেব ন্যায স্বদেশানুবাগী, প্রীতিভক্তিপবাযণ, দযালু, পবোপকারপ্রিয জাতি পৃথিবীতে আব কোথাও হয় নাই এবং হইবে না। যখন স্কুলে পড়িতাম তখনও কাহাকে ভাবতমাতাব জন্য কাঁদিতে শুনি নাই, ভাবতমাতাব পূর্ব্ব গৌববেব আস্ফালনে আকাশপাতাল বিকম্পিত প্রতিধ্বনিত কবিতে দেখি নাই। কিছুদিন পরে দেখিলাম এক ব্যক্তি একটী কবিতা লিখিলেন এবং আব এক ব্যক্তি একটা মেলা বসাইলেন, আর অমনি ভারতমাতার জন্য কান্নাব বোল উঠিল এবং তাঁহাব উদ্ধাবের উদ্দেশে বীরত্বেব বিকট চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল। স্বদেশানুবাগেব ঐ যে একটা ভাণ আরম্ভ হইল, উহা দেখিযা ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম ভাবগুলিবও ক্রমে ক্রমে ঐরূপ ভাণ কবা হইতে লাগিল। আমবা পিতা মাতাকে ভক্তি করি না। কিন্তু বক্তৃতায, পুস্তকে, প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে পৃথিবীব পবলোকগত মহাপুরুষ-

দিগের কথা এমনই গদ্গদভাবে কহিযা থাকি এবং তাঁহাদের পূজা কবা না হইলে এতই তীব্র তিবস্কাব লোকের কর্ণগোচর কবাই যে, আমাদিগকে যাহারা জানে না তাহাবা বোধ হয মনে কবে যে, ভক্তি জিনিসটা ভূমণ্ডলে আমাদের মধ্যে প্রথম দেখা দিযাছে। আমাদের সহোদবে সহোদবে মিল হয না। আমবাই কিন্তু বড় বড় প্রেমতত্ত্ব লিখি, বিশ্বপ্রেমের কথায পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র, পত্রিকা পূর্ণ কবিযা ফেলি। এইরূপ অনেক বিষযেই দেখিতে পাই, আমাদেব অন্তরে কিছুই নাই, কিন্তু মুখে ও লেখনীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহিযাছে। রাগ জিনিসটা খুব ভাল না হইলেও, স্থল বিশেসে উহাবও প্রযোজন আছে। কিন্তু আমাদেব বাগও নাই। পাহারা-ওযালায কোথাও কাহাকে পাঁচ আইনেব নাম করিযা ধবিলে যাহাবা এইরূপ লেখে—পথিক পথেব ধাবে বসে নাই, বসিবাব উপক্রম করিতেছে মাত্র,এমন সময দুই দিক হইতে দুই জন কনস্টেবল যমদূতের ন্যায আসিযা তাহাকে ধবিল। ইহা দেখিযা কে না বলিবে যে দেশ অত্যাচাবেব স্রোতে ভাসিযা যাইতেছে, ঘোব অরাজকতা হইযা উঠিযাছে,

দেশে ইংরাজ বাজ্য আর নাই, দেশটা মগের মুলুক হইযাছে ?—সত্য সত্যই তাহাদেব বাগ নাই। তাহাবা স্বদেশানুবাগ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির যেমন ভাণ করে, রাগেবও তেমনই ভাণ কবে। সুতবাং তাহাদেব বাগেব ভাষাও যে প্রকৃতিব, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতিব ভাষাও সেই প্রকৃতিব। প্রীতি, ভক্তির ন্যায আমাদেব চিন্তাশীলতাবও বড় অভাব। কিন্তু সে জন্য আমাদেব কিছুই অ সিযা যায না। আমবা প্রীতি ভক্তি প্রভৃতিবও যেমন ভাণ কবি, চিন্তাশীলতাবও তেমনই ভাণ করি। আমবা গভীব কথা কহিতে পারি না, কিন্তু গভীব লেখক বলিযা প্রশংসিত হইবাব জন্য লালাযিত। সুতবাং বিপরীত বাগ্‌জাল বিস্তাব কবা ভিন্ন আমাদেব আব উপায নাই। সহজ কথায বক্তব্য বলিলে লোকে চিন্তাশীল বলিবে না, এই মনে কবিযা ঘুবাইযা ফিরাইযা ফুলাইযা ফাঁপাইযা উহা বিষম বাঁকা করিযা বলি। পবিষ্কাব কবিযা কথা কহিলে সকলেই বলিবে, সামান্য কথা, না কহিলেই হইত; এই জন্য প্রাণান্তকর প্রযাসে হেঁযালীব ছন্দে কথা কহি, যেন কথাব ভিতব কতই গূঢ় তত্ত্ব লুকাইয়া

রাখিযাছি, বুদ্ধি থাকেত বুঝিযা লও। এই সকল কাবণে এখনকার বাঙ্গালা লেখায নানা দোষ। বিস্তর গুরুতব দোষ জন্মিতেছে। বাহুল্য দোষ বিষম প্রবল। যাহা তিন ছত্রে লেখা যায, তাহা টানিযা ত্রিশ ছত্র কবা হয; যাহা ত্রিশ পৃষ্ঠায শেষ কবা উচিত, তাহা ফাঁপাইযা ফুলাইযা তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কবাও কঠিন হয়। তিলে খাজাব গুড়ও বোধ হয এত টানা হয না; পাঁউরুটিব মযদাও বোধ হয এত ফাঁপান হয না; কুমড়া বড়িব দালও বোধ হয এত ফেনান হয না। সবলতাবও বড অভাব। কেহ খাঁটি মনেব কথা খাঁটি কথায কহিতেছে, অনেক স্থলে এরূপ বুঝিতে পাবা যায না। পবনিন্দায যেন প্রাণ পাড়িযা আছে, কুৎসাব তুল্য জিনিস যেন আর নাই। গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ততাব পবিবর্ত্তে অনেক স্থলে চপলতা, আস্ফালন, উগ্রতা এবং ঔদ্ধত্যের বিষম প্রাদুর্ভাব দেখা যায। লিখিবাব বিষযেব লঘুত্ব গুরুত্বের পবিমাণ কবিতে না পাবিযা অনেকে সকল বিষযেই সমান বাচালতা প্রদর্শন করেন, সমান আডম্বব আস্ফালন করেন। রাগ ত কথায় কথায; তেজেব সীমা নাই, যেন সকলেই

এক একটা দুর্ব্বাসা। সপ্তমে ভিন্ন অনেকে সুর ধরিতে পারেন না—গীত গোষ্পদেরই হউক, হিমালয় হিন্দুকুশেরই হউক। আমাদের সাহিত্যের এক একটা প্রদেশে বাস করিতে পারা যায় না, প্রবেশ করিতেও ভয় হয়। সেখানে ঝড় ভিন্ন আর কথা নাই, বাতাস উঠিল কি অমনই ঝড়—অষ্ট-প্রহর ঝড়। কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র পল্লীর একটী অতি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের প্রথম বৎসরটী অতিবাহিত হইবামাত্র একটা মহোৎসব হইল। অমনি ঝড় উঠিল—

যে সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষের অনন্ত কৌশলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কাল অনন্ত পথে পরি-চালিত হইতেছে তাঁহার অসীম কৃপায় আমাদের এই পুস্তকালয় আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

যে ঝড়ে ধূলা বালি উড়াইয়া লোককে কেবল জ্বালাতন করে,-সে ঝড় মরুভূমে যত বহিয়া থাকে অন্য কোন স্থানে তত বহে না। আমাদের মনগুলা মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা লেখার যে সকল দোষের অতি অল্পমাত্র উল্লেখ করিলাম, সে সকল দোষ পণ্ডিত শ্রেণীর

লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দোষ সংখ্যায়ও যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিতেও তেমনই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এই সকল দোষের সম্পূর্ণ সংস্কার না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে না, সাহিত্য সমাজের যে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে সে মঙ্গল সাধন করিতে ত পারিবেই না, অধিকন্তু বিষম অনিষ্ট সাধন করিবে। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিতেছে। কিন্তু এ সকল দোষের সংস্কার সহজে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল দোষের উৎপত্তি আমাদের মনে। আমাদের মনের সংস্কার না হইলে, মনের সারবত্তা না জন্মিলে, এ সকল দোষের ও সংস্কার হইবে না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সারবত্তা বাড়িবে না। মনের সংস্কার বড়ই কঠিন, মনের অসারতা ঘুচিয়া সারবত্তা হওয়া, সামান্য শিক্ষার ও স্বল্প সাধনার কাজ নয়। সুতরাং এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শ্রেণীর দোষ যে শীঘ্র তিরোহিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তবে লেখকেরা

ইচ্ছা করিলে যে এইরূপ কোন কোন দোষের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিকার করিতে পারেন না, ইহাও মনে করিতে পারি না। যাহা ৭।৮ ছত্রে লিখিতে পারা যায়, প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ছড়াইয়া এক শত ছত্রে না করিয়া অন্ততঃ পঞ্চাশ ছত্রেও শেষ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল মনে প্রতিজ্ঞা সহজে আসে না, আসিলেও অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাও সংস্কার পক্ষে একটা অন্তরায় বটে। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দিকটা ছাড়িয়া এখন আর এক দিকে যাইব। সে দিকে যে দোষ আছে তাহা গুরুতর হইলেও, এত গুরুতর নহে, তাহার প্রতিকারও এত কঠিন হইবে না।

কয়েক বৎসর দেখিতেছি, গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশ পূর্ণ ভাষা পুস্তক প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ :—

(১) তাঁর সেই কোমল স্নেহের স্বরে আমি অনেক তৃপ্তি অনুভব করলুম, বললুম।

(২) আমি আজ বিশ্রাম কচ্ছি।

(৩) দুপুরের সময় একাই বেড়াতে বেরলুম।

(৪) বদরিকাশ্রম ত্যাগের প্রস্তাব **কল্লুম**।
(৫) আমার সঙ্কল্প আমি **ছাড়চিনে**।
(৬) লাঙ্গল খানা **ধড়াস** করিয়া ফেলিয়া।
(৭) এক **খাবল** তৈল লইয়া।
(৮) কেহ তোমার কাছে **ঘেড়োবে** না।
(৯) তাঁহার ভোগ বিলাস নাই, তিনি আহার করেন অনাথ অনাথিনীরা যা তাই, তাহার **চেয়ে খারাপ** ত ভাল নয়।
(১০) সারস পক্ষী অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত **টপাটপ্** রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।
(১১) বিষয় স্পৃহা তাহার মনের **চৌকাট ডিঙাইতে** পারে না।
(১২) নগরকে নগর কাটিয়া **ওয়ার** করিয়া দেয়।
(১৩) পথশ্রান্তি নিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেই খানেই তাম্বু **গাড়িতে** আরম্ভ করিল।

পুস্তকাদিতে একরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। একরূপ ভাষায় সাহিত্যের মর্য্যাদার হানি হয়। আপনা আপনির মধ্যে কথা কহিতে হইলে,

কথার শ্লীলতা, সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্যের দিকে কেহই অধিক দৃষ্টি রাখে না। কথা ভাঙ্গিযা হউক, মুচড়াইযা হউক; যেমন করিযা হউক, শীঘ্র ও সংক্ষেপে কহিতে পারাই সকলে আবশ্যক মনে করে। কিন্তু পুস্তকাদি লিখিযা বাহিরের লোকেব সহিত,সমাজেব সহিত কথা কহিতে হইলে, লোকে ভিন্ন প্রণালীতে কথা কহে, শব্দেব সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য, শ্লীলতা, সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি বাখে। অনেক বিষয়ে মানুষেব আচাব, ঘবে এক প্রকাব, বাহিবে ভিন্ন প্রকাব। মানুষেব পরি-চ্ছদ, ঘবে আপনাব লোকের কাছে এক প্রকার, বাহিবে অপর লোকেব কাছে অর্থাৎ সমাজে ভিন্ন প্রকাব। গৃহে আমবা ক্ষুদ্র হউক, মলিন হউক, এক খানা বস্ত্র পবিধান কবিযা থাকি, গৃহের বাহিবে যাইতে হইলে, এক খানি ভাল বস্ত্র পবিধান কবি, গাযে একটী জামা দিই, এক খানি উড়াণী বা চাদবও গ্রহণ কবি। প্রবিচ্ছদেব সহিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পরিচয বড়ই অল্প, অপ্রাযটাই কিছু বেশী। কিন্তু গৃহেব বাহির হইতে হইলে, তাঁহারাও একখানা উত্তবীয স্কন্ধে ফেলিযা থাকেন। মলিন বা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিযা অপরের নিকট গমন করিলে, অপরের অম-

র্য্যাদা করা হয়, সকল দেশের লোকেরই এইরূপ সংস্কার। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলেই, পরিবার ছাড়িয়া সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেই, মানুষ একটু সাজসজ্জা করিয়া থাকে—পরিচ্ছদেও করিয়া থাকে, ভাষাতেও করিয়া থাকে—নহিলে সমাজের অমর্য্যাদা হয়। অনেকে বলেন, পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঘরে বাহিরে প্রভেদ করা অন্যায়, অযৌক্তিক। কিন্তু অন্যায়ই হউক আর অযৌক্তিকই হউক, প্রভেদটা এত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এত সর্ব্ববাদিসম্মত যে, উহা উঠাইয়া দিতে বলা যেমন বাতুলতা, অমান্য করা তেমনই ধৃষ্টতা এবং অশিষ্টতা। সাহিত্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে সমাজের অবমাননা করা হয়।

সাহিত্যে এরূপ ভাষা পরিহার করিবার অন্য হেতুও আছে। একই শব্দ লোকে নানা স্থানে নানা প্রকারে ভাঙ্গে। 'খাইলাম' এই শব্দের একাধিক অপভ্রংশ আছে :—

১ খেলাম ; ২ খালাম , ৩ খেলুম , ৪ খেনু।

'গমন করিলাম', ইহারও একাধিক অপভ্রংশ প্রচলিত দেখা যায়

১ গেলাম ; ২ গেলুম ; ৩ গেনু।

'করিলাম', ইহার ও ঐরূপ ঃ—

১ কর্‌লাম ; ২ কল্লাম, ৩ করলুম ; ৪ কল্লুম ; ৫ কন্নু।

অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। সকলে এক প্রকারে ভাঙ্গে না। সেই জন্য অপভ্রংশ নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। সে সকল আকারে এত প্রভেদ যে, এক জেলার লোকে অনেক স্থলে অন্য জেলার অপভ্রংশ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পারিবারই কথা। যাহারা 'করিলাম' ভাঙ্গিয়া 'কল্লুম' করে এবং যাহারা করিলাম ভাঙ্গিয়া 'কন্নু' করে, তাহাদের পরস্পরকে বুঝিতে না পারাই সম্ভব। শ্রীহট্টের অনেক লোকে 'করিলাম' শব্দ ভাঙ্গিয়া 'কল্লাম' শব্দের ব্যবহার করে, কিন্তু আমাদের ন্যায় 'কন্নু' শব্দের ব্যবহার করে না। সুতরাং আমাদের লিখিত কোন পুস্তকে 'আমি ঐ কার্য্যটী কন্নু', যদি এই বাক্যটী থাকে, তাহা হইলে অনেক শ্রীহট্টবাসী উহার অর্থ বুঝিতে পারিবে না। অপর পক্ষে কোন শ্রীহট্টবাসীর লিখিত গ্রন্থে যদি 'আমি ঐ কার্য্যটি করিতে পার্ত্তাম।।', এই বাক্যটী থাকে, তাহা হইলে

শ্রীহট্টবাসী উহাতে যাহা বুঝেন আমরা তাহা বুঝিব না, সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিব। কারণ 'করিতে পারতাম্ না' বলিলে আমরা বুঝি 'করিবার ক্ষমতা হইত না', কিন্তু শ্রীহট্টবাসী বুঝেন 'করিতে পারিব না'। শ্রীহট্ট-বাসী বলেন 'খাইমু', 'যাইমু', 'দিমু', 'আইঐন', আমরা বলি খাব,''যাব,''দিব','আসুন'। আমাদিগকে আমাদের নিজের অপভ্রংশাদির ব্যবহার করিতে দেখিয়া, শ্রীহট্টবাসীও যদি তাঁহার নিজের অপভ্রং-শাদির ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা আমরা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহার সাহিত্য আমাদের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। এইরূপে বঙ্গের সকল জেলার লোকে যদি পুস্তকা-দিতে আপন আপন অপভ্রংশাদির প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্গে জেলারসংখ্যা যত, বাঙ্গালা সাহি-ত্যের সংখ্যাও প্রায় তত হইবে। অতএব লিখিবার সময় সকলেরই এরূপ অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সাহিত্য সমস্ত সমাজের জন্য, খণ্ড সমাজের জন্য নহে, সমস্ত জাতির জন্য, স্থান বিশেষের অধিবাসীর জন্য নহে। উহাতে গ্রাম, মৌজা, মহকুমা বা জেলা

বিশেষের প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইলে, উহার যে প্রশস্ত জাতীয ভাব হওযা আবশ্যক তাহা হইতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে উহার একটা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য বা স্থানীয় ভাব জন্মিযা যায। সাহিত্য কি জিনিস, উহার মর্য্যাদা, পবিত্রতা, জাতি গঠন পক্ষে কার্য্যকাবিতা কত, স্বেচ্ছাচাবিতাব প্রাবল্য বশতঃ তাহা ভুলিযা, আমবা গ্রাম্যতাদিব বহুল প্রযোগে বাঙ্গালা সাহিত্যকে কলঙ্কিত, সঙ্কুচিত এবং অরুচিকব কবিযা তুলিতেছি।

আরও এক কথা। যে শব্দেব অপভ্রংশ নানা আকার ধাবণ কবে, তাহার অপভ্রংশেব ব্যবহাব কোন স্থানেই সুবিধা জনক, সমতাসাধক ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। নানা আকারেব মধ্যে সমস্ত লেখককে একটী নির্দ্দিষ্ট আকাব ব্যবহাব করাইবার জন্য কোন নিযমই নির্দ্ধারিত কবিযা দিতে পাবা যায না। এমন কি, একই লেখককে একটী নির্দ্দিষ্ট আকারের প্রযোগে আবদ্ধ করিতে পারাও কঠিন। উপরে যে কযটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে (১) ও (৪) একই লেখকেব রচনা হইতে গৃহীত। কিন্তু তিনি 'করিলাম' শব্দের পরিবর্ত্তে একই রচনার একস্থানে

'করলুম' আর এক স্থানে 'কল্লুম' প্রযোগ করিয়াছেন•। যখন এই সকল গ্রাম্যতাদির প্রযোগে একই লেখকেব ভাষায় সমতা রক্ষিত হওযা কঠিন, তখন সমস্ত লেখকে এইরূপ প্রয়োগের পক্ষপাতী হইলে, ভাষাব অসমতা জনিত বৈষম্যে বাঙ্গালা সাহিত্য কতই যে বিকৃত হইয়া উঠিতে পাবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতব বৈষম্য বাড়িলে, জাতিব ভিতবও বৈষম্য বাড়ে।

কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিযা লোকসাধারণেব মধ্যে প্রচারিত করা যখন সাহিত্যেব একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তখন পুস্তকাদিব ভাষা যতদূর সম্ভব সরল কবিবার জন্য গ্রাম্য শব্দাদিব প্রয়োগ হওয়াই আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যের মর্য্যাদা অমর্য্যাদাব কথা ছাড়িযা দিযা বিচার কবিলে, ইহা স্বীকাব কবা যাইতে পারে যে, যে লেখক ঐরূপ শব্দাদির প্রযোগ কবেন, ঐরূপ প্রযোগে তাঁহাব নিজেব মৌজা মহকুমা বা জেলার লোক সাধারণের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ প্রয়োগে, অপব সমস্ত স্থানেব লোকসাধারণেব যে অসুবিধা হওযা সম্ভব, বোধ হয ইহা

অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং এরূপ প্রয়োগে লোকসাধারণের উপকার অপেক্ষা অপকারের পরিমাণ অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব। এক ব্যক্তির রচিত একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে চুল্লী শব্দের ব্যবহার করা হয়। লেখকের এক সম্ভ্রান্ত, সম্মানার্হ, মহাজ্ঞানী, নানা শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, 'চুল্লী' শব্দের পরিবর্তে 'উনুন' শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হইত। তিনি কোন হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাবিয়া ঐ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 'উনুন' শব্দ যত লোকে জানে 'চুল্লী' শব্দ তত লোকে জানে না। আমাদের এই অঞ্চল সম্বন্ধে কথাটা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গের বহুতর স্থানে উনুন শব্দের ব্যবহার নাই। 'চুল্লী' বা 'চুলো' শব্দ বোধ হয় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। সুতরাং 'উনুন' শব্দ ব্যবহার করিলে যত লোকের বুঝিবার সুবিধা হয়, 'চুল্লী' বা 'চুলো' শব্দের ব্যবহারে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোকের বুঝিবার সুবিধা হয়। সাহিত্য সমগ্র দেশের জন্য, দেশের অংশ বিশেষের জন্য নহে; সাহিত্য সমস্ত জাতির জন্য, স্থান বিশেষের অধিবাসীর

জন্য নহে, ঐকথা যদি ভ্রম মূলক না হয, তবে যেরূপ অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতাদিব কথা কহিতেছি, তাহার ব্যবহাবে বাঙ্গালা বচনা দূষিত হইযা পড়িতেছে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্য নামেব অযোগ্য হইতেছে ও সমস্ত সমাজেব বা জাতিব যে সকল বৃহৎ কার্য্য সাহিত্য দ্বাবা সম্পাদিত হইতে পাবে, তাহা সাধন কবিবাব অনুপযোগী হইযা উঠিতেছে, ইহা স্বীকাব কবিতেই হয। গ্রাম্যশব্দাদিব ব্যবহাবেব জন্য কেবল লোকশিক্ষাব অসুবিধা হয তাহা নহে, জাতীয একতা বুদ্ধিব উদ্রেক ও পবিবর্দ্ধনেবও ব্যাঘাত ঘটে। লেখকেবা আপন আপন জেলা বা দেশাংশেব অপভ্রংশ ও গ্রাম্যতাদিব ব্যবহাবেব পক্ষপাতী হইলে, সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ স্থানীয অনুবাগ ও অভিমানেব নিদর্শন বেশী মাত্রায অনুভূত ও লক্ষিত হওযায, দেশেব লোকেব মনে পবস্পবেব মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানই প্রবল ও পবিপুষ্ট হইতে থাকে, সুতবাং একতা জ্ঞানের উন্মেষেব ব্যাঘাতই হয। ফলতঃ যেখানে আপন আপন দৃষ্টি, আপন আপন বিশেষত্বেব সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম কবিযা সমস্ত জাতিব অবাধ বিস্তৃতিব দিকে ধাবিত হয নাই, সেই খানেই সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ

প্রয়োগের বাহুল্য এবং উদার ও উন্মুক্তভাবের অভাবে সাহিত্য সেই খানেই সাহিত্য নামের অযোগ্য। এক্ষণকার বাঙ্গালা সাহিত্য একটী সাহিত্য নহে, নানা স্থানের নানা বিশেষত্ব দূষিত বহু সাহিত্যের সমষ্টি। এরূপ সাহিত্য যাহাদের, সাহিত্যের গুণে তাহাদের মধ্যে একত্বভাব ভাব উদ্রিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারা দূরে থাকুক, পার্থক্যের ভাবই প্রবল হয়। গ্রাম্যতাদির প্রয়োগের জন্য এই গুরুতর অনিষ্ট যে পরিমাণ ঘটিতেছে তাহার হ্রাস করা বেশী কঠিন নহে। যাচ্চি, কচ্চি, খাচ্চি না লিখিয়া যাইতেছি, করিতেছি, খাইতেছি লিখিতে কেবল একটু ইচ্ছার প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টি যেরূপ আত্মনিবদ্ধ, তাহাতে ঐ ইচ্ছাটুকু হওয়াও কিছু কঠিন বটে। কিন্তু ইচ্ছা হইলে লিখিবার অন্য বাধা থাকিবে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য আর এক প্রকারে আমাদের মধ্যে পার্থক্যের ভাব প্রবল করিয়া একতা বুদ্ধি উদ্রেকের ব্যাঘাত ও বিলম্ব ঘটাইতেছে। অনেক স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লিখিবার ধারা এক নহে, বিভিন্ন। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে লেখে—এ

কার্য্যটী না করিয়া পারি না ; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—এ কার্য্যটী না করিয়া থাকিতে পারি না। পূর্ব্ব বঙ্গের লোকে লেখে—তিরস্কৃত হইযা তিনি নীরব রহেন। পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—তিরস্কৃত হইযা তিনি নীরব থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে লেখে—প্রায় লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে ; পশ্চিম বঙ্গের লোকে লেখে—প্রায় সকল লোকে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লেখায় এইরূপ আরও অনেক প্রভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ প্রভেদ এত বেশী যে, পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক প্রধান প্রধান লোকে বিবেচনা করেন যে, তথাকার লেখকদিগের প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সুবিচার কলিকাতাস্থিত সেণ্ট্রাল টেকস্ট্বুক কমিটি কর্ত্তৃক হইতে পারে না। এবং সেই জন্য তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোক লইযা ঢাকা নগরীতে একটী স্বতন্ত্র টেকস্টবুক কমিটি গঠিত করাইবার জন্য একাধিক বার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। ইহাও শুনিযাছি যে, স্যর আণ্টনি ম্যাকডনেল মহোদয় যখন কিছু দিনের জন্য বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন একবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে

ঐরূপ আবেদন আসিযাছিল। কিন্তু তিনি এই বলিযা উহা অগ্রাহ্য করিযাছিলেন যে, একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য নির্ব্বাচনী সমিতি স্থাপিত হওযা বাঞ্ছনীয নহে। একই দেশের বা একই জাতির সাহিত্যে এ প্রকার প্রভেদ বা পার্থক্য থাকার অর্থ এই যে, সাহিত্য প্রকৃত জাতীয ভাব ধারণ করে নাই, জাতির ভিতর একতা জন্মে নাই বলিযা সাহিত্যেও একতাসূচক হইতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে মনের অসদ্ভাবও যথেষ্ট দৃষ্ট হয। পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদের মনে বেশী অসদ্ভাব কি পশ্চিম বঙ্গবাসীদের মনে বেশী অসদ্ভাব, সে কথার উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রযোজন। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, একই দেশের লোকের মনে পরস্পরের সম্বন্ধে কোন প্রকার অসদ্ভাব থাকা যার পর নাই দোষাবহ, শোচনীয এবং অনিষ্টকর। যাহাদের মধ্যে একপ অসদ্ভাব থাকে, তাহাদের মধ্যে একতার ভাব জন্মিতে পারে না, এবং তাহাদের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের ন্যায তাহাদের ভিতর সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি না করিযা, অসদ্ভাব ও অসূয়াই বাড়াইযা দেয।

কোন বাঙ্গালা পুস্তকে 'এ কথা না কহিয়া পারি না' অথবা 'তিনি লোকের কাণ কথা ধবিযা কার্য্য কবেন' অথবা এইরূপ আর একটা কিছু দেখিলেই, এ অঞ্চলেব লোকে বিদ্রূপ করিয়া উঠেন। সুতবাং বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেব মধ্যে অসদ্ভাব বাড়াইযা দিতেছে, অন্ততঃ কমিতে দিতেছে না। এরূপ সাহিত্য সাহিত্যই নহে। সাহিত্য সমাজ বাঁধিবে, জাতি গড়িবে—সদ্ভাব বৃদ্ধি কবিবে, বিবোধ বিদ্বেষ বিদূবিত কবিবে—পার্থক্য জ্ঞান নষ্ট করিয়া একতাব ভাব ফুটাইযা ফলাইযা দিবে। তবেই সাহিত্য সাহিত্য নামেব যোগ্য হইবে—প্রকৃত সাহিত্যেব উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মহৎ কার্য্য সাধন কবিতে হইলে, এই মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে হইলে, সাহিত্যকে স্থানীয কাবণজাত সমস্ত অনিষ্টকব বিশেষত্ব ও বিভিন্নতা পবিহাব কবিযা, একটা সুনির্ম্মিত সুন্দব সমতাময আকাব ধাবণ কবিতে হইবে। কথাব সমতায মনেব সমতা আনিযা দেয। দর্শনেন্দ্রিযকে যে চোক্ বলে, তাহাকে আপনাব বলিযা মনে হয, যে আঁখ বলে তাহাকে যেন একটু পব বলিযা বোধ

হয়। যাহাদের কথা বা ভাষা এক নয়, তাহাদের মনে মনে তেমন মিল হয় না, তাহারা এক জাতি হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কথায় এখন সম্পূর্ণ সমতা নাই, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মনেরও সমতা নাই। দুইটী বিভাগের ভাষা যেন এক নয; বলিতে বড় দুঃখ হয়, দুইটী বিভাগের লোকেও যেন দুইটী জাতির ন্যায় হইযা আছে। দুইটী বিভাগের কথার সম্পূর্ণ সমতা হইলে, সেই সমতার ফলস্বরূপ ক্রমে ক্রমে দুইটী বিভাগের মনেরও সমতা হইযা, সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে একতার ভাব উদ্রিক্ত হইয়া কালে প্রবল হইযা উঠিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কথার এই সমতা কি প্রকারে সাধন করা যায়। সাধন করিবার একমাত্র সদুপায আছে—পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে যে দুইটি বিভিন্ন বাগ্‌ধারা (Idiom) আছে, তন্মধ্যে একটীকে ছাড়িযা দিযা অপরটীকে সর্ব্বত্র প্রচলিত করা। এখন কথা হইতেছে—কোন্‌টীকে ছাড়িযা দেওযা যাইবে? আপনার বাগ্‌ধারা প্রভৃতি ছাড়িযা দিযা অন্যের বাগ্‌ধারা প্রভৃতি

গ্রহণ করিতে মনঃকষ্টও হয়, চিরন্তন অভ্যাস ত্যাগ করিবার যে কষ্ট সে কষ্টও হয়। সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা যদি আমার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ইহার এই মীমাংসা করিতাম যে, আমরা পশ্চিম বঙ্গবাসী, আমরাই আমাদের নিজের ধারা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতাদিগকে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিই। কিন্তু এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা মীমাংসা-কারীর আপন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি মত হইতে পারে না, সর্ব্ব সাধারণের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনানুসারে করিতে হয়। যে ধারাটী ছাড়িয়া দিলে স্বল্পতর লোকের কষ্ট, সেইটী ছাড়াই যুক্তি সঙ্গত; যে ধারাটী ছাড়িয়া দিলে অধিকতর লোকের কষ্ট, সেইটী রাখিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী নামক পুস্তকাগারের পুস্তকতালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের সমস্ত বিভাগে যত পুস্তক প্রকাশিত হয়, এক বৃটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় তাহার আড়াই গুণেরও অধিক প্রকাশিত হয়। বিগত ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ভাগলপুর, বর্দ্ধমান,

চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, ঢাকা, প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী, এই সমস্ত বিভাগে ৪৪৪ খানার বেশী পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু এক মহানগরী কলিকাতাতে ১০৬২ খানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের পুস্তক সংখ্যার সহিত পশ্চিম বঙ্গের ভাগলপুর, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও রাজধানী কলিকাতার পুস্তক সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৯৭ সালে পূর্ব্ববঙ্গে ২২০খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ১২৪২ খানা প্রকাশিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব বঙ্গকে আপন ধারা ছাড়িতে হইলে যত লেখককে নূতন ধারা শিখিবার কষ্ট পাইতে হইবে, পশ্চিম বঙ্গকে আপন ধারা ছাড়িতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোককে নূতন ধারা শিখিবার কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব পূর্ব্ব বঙ্গেরই আপন ধারা ছাড়িয়া পশ্চিম বঙ্গের ধারা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আবার কলিকাতা এখন বঙ্গের রাজধানী। এ জন্যও পশ্চিম বঙ্গের ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালীর আদর্শ ভাষা হওয়া উচিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়ার ভাষাই বঙ্গে আদর্শ ভাষা

বলিয়া গণ্য হইত। অতএব কলিকাতার ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে, আমাদের রীতি ও ইতিহাস সঙ্গত কার্য্যই করা হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ যদি কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহারই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌরবহানি বা হীনতা ঘটিল ভাবিয়া তাঁহার মনঃকষ্ট পাইবারও কারণ থাকিবে না। রাজধানীর সম্মান সকল দেশেই আছে, সকল লোকেই করে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ,বিদ্বেষ ও ঘৃণার হেতুভূত করিয়া না রাখিয়া, উহাকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির একতা সাধক শক্তি করিয়া তুলিতে হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, সমস্ত বঙ্গকে একই ভাষায় কথা কহিতে হইবে। একই জাতির মধ্যে ভাষার প্রভেদ, সাংঘাতিক প্রভেদ : ও প্রভেদ আমাদিগকে তুলিয়া দিতেই হইবে। ও প্রভেদ তুলিয়া দিতে সময় আবশ্যক, অনেককে অনেক কষ্টও পাইতে হইবে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, সকলকে সে কষ্ট পাইতে হইবে না, বলিয়া,

যাঁহার সে কষ্ট স্বীকাব না করিলে নহে, তাঁহাব যেন বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতিব এই মহোপকাব সাধন করিতে প্রবৃত্তির অভাব না হয।

এই সংস্কাব সাধন কবিতে হইলে অগ্রে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তববঙ্গ প্রভৃতি স্থানেব ভিন্ন ভিন্ন বাগ্‌ধাবাদি সংগ্রহ কবিয়া একখানি পুস্তক প্রস্তুত করা আবশ্যক। মৃত আনন্দবাম বড়ুযা মহাশয এইরূপ সংগ্রহ করিবাব কল্পনা কবিযাছিলেন। বোধ হয তাঁহাব প্রস্তাবটী গবর্ণমেণ্টেব গোচবীভূতও করিযাছিলেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে অকালে লইযা গিযাছে। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যের ভাব গ্রহণ করিবেন না কি? কার্য্যটী পবিষদেবই ত করণীয।

এইবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটী লক্ষণেব উল্লেখ কবিব। জেলা ভেদ বা বঙ্গের পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ, সে লক্ষণের হেতু নহে। সে লক্ষণের হেতু আমাদের ইংবাজী শিক্ষা। আমরা বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজী লেখা পড়া বেশী করি। এই কারণে আমরা যে বাঙ্গালা লিখি তাহা অনেক স্থলে বাঙ্গালা হয় না, ইংরাজী হইয়া পড়ে। গুটিকতক উদাহরণ দিতেছি।—

(১) আমরা নিরুপায ভাবে ইংরাজের হস্তগত হইয়াছি।

(২) এই উভযেব মধ্যে কেবলমাত্র মাত্রার প্রভেদ বকমের প্রভেদ নয।

(৩) তৈত্তিরীয উপনিষদের এই উক্তি ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক সমযকে আলিঙ্গন কবিতেছে।

(৪) ঐ যে যুবক ঘোডায চড়িয়া আসিতেছে উহার প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত।

(৫) বুদ্ধি ভোজ্য লাভ করে।

(৬) অভিমানী, কাপুরুষেব মত অন্ধকারে আঘাত কবিতে জানে না।

(৭) পৃথিবীতে পৃথিবী প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে?

(৮) কাজের সুবিধার জন্য ভাব গৌরবকে বলিদান দিতে তাঁহাদের অনেকে কুণ্ঠিত হন না।

(৯) উপকারের নামে যাহারা অপকার ঘটায়, তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অভিসম্পাত।

(১০) আমরা এক কালে এত বড় ছিলাম যে ইউরোপের অত বড় হইবাব সম্ভাবনা অতি ভগ্নাংশিক।

(১১) তাঁহার মহৎ মন এরূপ নীচাশযতার অনেক উপরে বাস করিত।

(১২) গবর্ণর্জেনবল বাহাদুব এই কারণ বশতই উপস্থিত জুরি বিল হইতে নিজের হস্ত প্রক্ষালন কবিয়াছেন।

(১৩) গাছকাটা, চাষকবা প্রভৃতি কার্য্য পর্য্যায়-ক্রমে ইহাঁদেব দৈনিক জীবন ব্যাপ্ত কবিত।

(১৪) একমাত্র শৃগালেব বব সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবিতেছে।

(১৫) এরূপ কথা মানিযা লওযাব পূর্ব্বে দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক।

(১৬) লোকনিন্দায তাহাবা যেরূপ নিকৃষ্ট প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে।

(১৭) একটী সূচেব অগ্রভাগে দুইটী স্বর্গীয দূত দাঁড়াইতে পাবে না।

(১৮) তখন লজ্জা আসি সুন্দরীব গালে আঁকিল গোলাপ।

(১৯) প্রতিযোগিতাব দিনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন স্বাভাবিক নিযম।

(২০) যাঁহাবা এই অনন্ত 'কাল সমুদ্রের সৈকত

ভূমিতে আপনাদিগের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

(২১) বস্‌ওয়েল জন্‌সনের আত্মাব ভারে একেবারে অভিভূত ছিলেন।

(২২) তাঁহাব স্বাভাবিক বুদ্ধি জনসনেব নিকটবর্ত্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত।

(২৩) পৃথিবীব অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে।

(২৪) তাহাদেব দেহেব পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদেব নাসাব সম্মুখে সর্ব্বদাই উদ্যত হইযা আছে।

(২৫) অবিমিশ্র উত্তম কিছুই থাকিতে পাবে না।

(২৬) সভ্যতাব মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে, যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের উপর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতাব নিকট ভক্তি

নম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাঁহা এইরূপে ক্রমশঃই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড় বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

যে স্বল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ইংবাজী শিখিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ বাঙ্গালা বুঝিলেও বুঝিতে পারেন, অনেক স্থলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যে কোটি কোটি বাঙ্গালী ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা যে ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পাবে না। সুতরাং এখনকাব বাঙ্গালা সাহিত্যেব যে অংশ এই প্রকারে লিখিত, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গের লোকসাধারণের কোন জ্ঞানই লাভ হয় না, কোন উপকাবই হয না। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে উহা থাকা না থাকা সমান। একথার অর্থ এই যে, ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যে সাহিত্য প্রস্তুত করিতেছেন তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য নহে—যে অসংখ্য অগণিত লোক লইয়া বাঙ্গালী জাতি, সে সাহিত্যে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ছাড়া, সাহিত্য প্রধানতঃ সর্ব্বসাধারণের

পাঠ্য। সুতরাং সাহিত্য যত অধিক লোকের উপযোগী হয়, উহার সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হইয়া জাতীয় ভাব তত প্রবল হয় এবং উহার সাহিত্য নামও তত সার্থক হইতে থাকে। যে সাহিত্য কেবল বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষের উপযোগী, তাহা জাতীয় সাহিত্য নহে, সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। জ্ঞানবিস্তার ও জাতীয় একতা সাধনরূপ যে মহৎ কার্য্য প্রকৃত সাহিত্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়, উহা দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে ত পারেই না, অধিকন্তু উহার প্রভাবে সমাজের শ্রেণী বিশেষ লোক সাধারণের সম্বন্ধে সহানুভূতি শূন্য হইয়া, সমাজের ভিতর একটা বিষম অনিষ্ট-কারী পার্থক্যের সূত্রপাত করিয়া, তাহার পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে লক্ষণের কথা কহিতেছি, স্বদেশের লোক সাধারণের সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অনাস্থা ও সহানু-ভূতিশূন্যতাই তাহার উৎপত্তির অন্যতম কারণ এবং প্রবলতার প্রধান হেতু। কিরূপ ভাষায় ও ভঙ্গিতে লিখিলে আমাদের আপন আপন মনস্তুষ্টি হয়, লিখিবার সময় আমাদের কেবল সেই দিকে দৃষ্টি

থাকে, আমাদের লেখা পড়িতে অপরের বিরক্তি বা বুঝিতে কষ্ট হইবে কিনা, সে কথাটা বোধ হয় আমাদের মনে একেবারেই উদয় হয় না। অপরে পড়িয়া শিক্ষা লাভ করিবে, এই অভিপ্রায়ে আমরা যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখি, তাহাও অনেক স্থলে কেবল আমাদের আপনার আপনার সন্তোষ-জনক করিয়া লিখি, যাহারা পড়িবে তাহাদের উপযোগী করিয়া লিখিতে পারি না। আমাদের দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ, আমাদের মন এতই আত্মনিবদ্ধ। আমরা অন্যের ভাবনা ভাবিতেই পারি না। সহানুভূতি জিনিসটা আমাদের থাকিতেই পারে না। আমরা স্বদেশানুরাগ বা স্বদেশবাসীর সহিত সহানুভূতির যতই আস্ফালন করি না কেন, প্রকৃত পক্ষে দুইয়ের একটাও আমাদের নাই। বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য যে প্রকৃত সাহিত্য নহে, উহা যে জাতীয় ভাবে গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে না, উহা যে একতা সাধন পক্ষে সাহায্য না করিয়া আমাদের ভিতর বিরোধ, বিদ্বেষ, বৈষম্য বাড়াইতেছে ও পার্থক্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, ইহাই তাহার একটী প্রবল কারণ। সাহিত্যে মানুষ গড়ে,

সমাজ গড়ে, জাতি গড়ে সত্য; কিন্তু মানুষে সাহিত্য না গড়িলে, সাহিত্য ও কিছুই গড়িতে পারে না। স্বার্থান্বেষী স্বেচ্ছাচারী দ্বারা সাহিত্য গঠিত হওয়া অসম্ভব।

যে ভাষার অধিক অনুশীলন করা যায়, সে ভাষার ধারাধরণ অনেকটা আয়ত্ত হইয়া উঠে এবং উহার প্রয়োগ কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। আমরা ইংরাজীর অধিক অনুশীলন করি বলিয়া, আমাদের বাঙ্গালা অনেক স্থলে ইংরাজী রকমের বাঙ্গালা হইয়া পড়ে। সুতরাং এ দোষের সংস্কার কিছু কঠিন। কিন্তু ইচ্ছা অথবা প্রতিজ্ঞা করিলে, এ দোষেরও সংস্কার যে না হয় তাহা নহে। লিখিবার সময় দুইটী কথা মনে রাখিলে, এ দোষ ক্রমে কমিয়া যাইতে পারে। একটী কথা এই যে, আপন ভাষায় লিখিতে হইলে, আপন ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া লেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাহা আপন ভাষার প্রণালীতে ব্যক্ত করিতে পারা যায়, তাহা অপরের ভাষার প্রণালীতে ব্যক্ত করিলে, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের অতি শোচনীয় ও লজ্জাকর অভাব প্রদর্শন

করা হয়। ইংরাজ অপরের প্রণালীতে ইংরাজী লিখিতে ঘৃণা বোধ করেন; অপরকে ইংরাজী হইতে ভিন্ন প্রণালীতে ইংরাজী লিখিতে দেখিলে, কতই উপহাস করেন। ইংরাজ মানুষ, ইংরাজের আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে। বাঙ্গালা ভাষা দরিদ্র হইলেও, এত দরিদ্র নহে যে, ইংরাজী রকমে বাঙ্গালা না লিখিলে চলে না। 'আমরা নিরুপায় ভাবে ইংরাজের হস্তগত' একথার যে অর্থ, 'ইংরাজ আমাদিগকে এমনই হস্তগত করিয়াছেন যে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই', এ কথার ও কি সেই অর্থ নহে? 'ঐ যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত' এই কথার অর্থ, এবং 'ঐ যুবক যে উচ্চ কুলশীল সম্পন্ন উহার দেহের যে কোন অঙ্গ দেখিলে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না' এই কথার অর্থ কি এক নয়? আর একটী কথা এই যে, লেখা কেবল লেখকের নিজের সক মিটাইবার বা মনস্তুষ্টির জন্য নহে। লেখা প্রধানতঃ পরোপকারার্থ, অর্থাৎ, অপরে পড়িয়া উপকৃত হইবে বলিয়া। অতএব যে প্রণালীতে লিখিলে অপরে লেখা বুঝিতে পারিবে না, সে প্রণালীতে লিখিতে নাই, লিখিলে সহৃদয়তা,

সহানুভূতি ও স্বদেশীযের প্রতি অনুরাগের সম্পূর্ণ অভাব প্রকাশ পায়। 'যুবকের প্রতি অঙ্গে উচ্চ কুলশীল নিখাত' যে কযজন বাঙ্গালী ইংরাজী জানেন তাঁহারা এ কথার অর্থ বুঝিলেও বুঝিতে পারেন। কিন্তু যে অসংখ্য বাঙ্গালী ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা এ কথার কোন অর্থই করিতে পারিবেন না। কেবল মাত্র আপনার অথবা আপনারই ন্যায় দুই চারি জনের তৃপ্তির উপর দৃষ্টি রাখিযা না লিখিযা, যে অগণ্য স্বদেশবাসী আপনার ন্যায় নহেন তাঁহাদের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা লিখিলে, এরূপ লেখা অসম্ভব হইযা পড়ে। এই দুইটী কথা মনে রাখিযা লিখিবার চেষ্টা করিলে আমাদের মহদুপকার সাধিত হইবে। আমাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ক্রমে বাড়িতে থাকিবে। আমাদের আত্মনিবদ্ধতা কমিযা সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য লোকশিক্ষার অন্তরায় না হইয়া, সুশিক্ষা প্রচারে বহুল পরিমাণে সহাযতা করিবে,এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদাযিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত জাতীয় ভাব ধারণ করিবে। যে দিন বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য করিয়া তুলিতে পারিব,সেই

দিন দেখিতে পাইবে যে, সাহিত্য মানুষ গড়িযাছে, সমাজ বাঁধিয়াছে। সেই দিন বুঝিতে পারিব, সাহিত্য অবলম্বন করিযা মানুষ কত উচ্চে উঠিতে পারে। সাহিত্যের কত শক্তি, সাহিত্য কত মহৎ, কত কঠিন কার্য্য সাধন করিতে পারে—সেই দিন তাহার পূর্ণ উপলব্ধি হইবে।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালা রচনার যে বিকৃতি ঘটে, তাহা নিবারণ করিবার আর একটী উপাযের উল্লেখ করিলে ক্ষতি নাই। মানুষ যেরূপ হইতে চেষ্টা ও যত্ন করে, সেইরূপ হইযা থাকে। মন্দ লোকে ভাল হইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ভাল হইলে তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হয, সে আর মন্দ কাজ করিতে পারে না। বাঙ্গালী ইংরাজ হইবার চেষ্টা করিলে, ইংরাজ হইযা যায না বটে, কিন্তু অনেকটা ইংরাজের ন্যায হয। তখন তাহার বাঙ্গালীত্ব কতকটা বিলুপ্ত হইযা যায এবং সে বাঙ্গালীর ন্যায আচরণ করিতে কিযৎ পরিমাণে অক্ষম হইযা পড়ে। বাঙ্গালী যদি ইংরাজের ন্যায ইংরাজী লিখিবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইংরাজের ন্যায নিখুঁত বা নির্দ্দোষ

ইংরাজী লিখিতে পারুন আর নাই পারুন, যে মানসিক ধাতু বা মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি হইতে ইংরাজের ইংরাজী রচনার বিশেষত্ব উদ্ভূত হয়, তাঁহাতে তাহা সংক্রমিত হইয়া যায় এবং তিনি বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালা রচনা করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। ইংরাজের মানসিক ধাতু প্রাপ্ত না হইলেও, ইংরাজী রচনার বিশেষত্বের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি রাখিবার ফলে, ঐ রচনার রীতি তাঁহার এতই অভ্যস্ত ও প্রিয় হইয়া থাকে যে, আপন ভাষায় রচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই হয় না; এবং প্রবৃত্তি হইলেও, ইংরাজী রচনার প্রণালীতে আপন ভাষায় রচনা করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর থাকে না। ইংরাজী রচনায় সুনিপুণ আমাদের এমন দুই এক জন পরলোকগত মহাত্মার বাঙ্গালা রচনায় একথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য ও রচনার এত পক্ষপাতী হইলে, অধিকাংশস্থলে বাঙ্গালীর আপন ভাষায় লিখিবার প্রবৃত্তিই হয় না। যে দুই এক জন মৃত মহাত্মার উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের সময়ে তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা সম্পন্ন আরও কতকগুলি বাঙ্গালীর অভ্যুদয়

হইয়াছিল। ইংরাজী রচনায় তাঁহারাও সুনিপুণ ছিলেন। ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী লেখা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য, তাঁহাদের অনেকের এইরূপ ধারণা ছিল। এই কার্য্য তাঁহারা প্রাণপণেই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, ইহাতে কোন ফল হয় নাই। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদিতে ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বা সমৃদ্ধিও কিছু মাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই; ইংরাজী লেখক বলিয়া তাঁহাদের যশও, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, কাহারই মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী এখন তাঁহাদের ইংরাজী রচনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পরেও অনেকে নিখুঁত ইংরাজী লিখিবার জন্য প্রাণান্ত করিয়াছেন। কোন্ ইংরাজ গ্রন্থকার কোথায় কোন্ শব্দের কেমন প্রয়োগ করিয়াছেন, কোথায় ' the ' শব্দ ব্যবহার করিলে দুরপনেয় কলঙ্ক হয়, কোথায় ' the' শব্দ ব্যবহার না করিলে মার্কিণত্ব বা স্কচত্ব বা আইরিষত্ব বা বাঙ্গালীত্ব প্রকাশ পায়, এই সকল নিরূপণে তাঁহারা সদাই ব্যস্ত, এই ভাবনায় তাঁহারা নিয়তই আকুল। তাঁহাদের রচনায় সমান্য একটু ক্রটী ঘটিলে তাঁহাদের দশ দিন আহার নিদ্রা হয় না,

বৃশ্চিক দষ্টের ন্যায তাঁহারা ছট্ ফট্ করিযা বেড়ান, মনে করেন—লোকে আমাদিগকে কি মূর্খ, কি অপদার্থ ই ভাবিতেছে, এমন লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহারা যথার্থই রোগগ্রস্ত। তাঁহাদিগের ইংবাজী বচনাব অভিমানাদি দেখিলে দুঃখ হয় এবং সেই অভিমান জনিত স্পর্দ্ধাদিব আতিশয্য দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইযা পড়ে। বিদেশীয ভাষায রচনা নৈপুন্য লাভ করা মন্দ, এমন কথা বলি না। লাভ কবা হয়, ভালই, কিন্তু লাভ কবাকে চতুর্ব্বর্গ লাভেব তুল্য জ্ঞান করিযা, তদর্থে প্রাণপাত কবা, বিশেষ বুদ্ধিমত্তাব ও স্বদেশ প্রিযতার কার্য্য বলিযা বিবেচনা কবা যাইতে পাবে না। অনেক ইংরাজ সংস্কৃত শিক্ষা করেন, সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যও লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট রচনা করিবাব প্রযাসী দেখা যায না। সম্প্রতি কলিকাতার একটী সভায সংস্কৃতে একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হইযাছিল। সভাপতি অক্‌সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালযের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বেণ্ডল মহোদয বক্তৃতান্তে বলিযাছিলেন—'আমি সংস্কৃতে বক্তৃতা কবিব না। সংস্কৃতে কখনই ভাল বক্তৃতা কবিতে পারি না।'

ফলতঃ যে সকল ইংরাজ বা ইউরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই উহা শিক্ষা করেন, সংস্কৃত লেখক বলিয়া সুখ্যাতি লাভের প্রয়াসী হয়েন না এবং প্রয়াসী হওয়াও বোধ হয় সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন না। যে সকল ইংরাজ বাঙ্গালা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। বিবি নাইট ইংরাজীতে বিষবৃক্ষের অনুবাদ করিয়াছেন—ইচ্ছা, ঐ গ্রন্থে বাঙ্গালীর দাম্পত্যপ্রণয়ের যে চিত্র আছে তাহা স্বজাতীয়দিগকে দেখান। কিন্তু নিজে কখন দুই ছত্র বাঙ্গালা লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বুদ্ধিমানেরা এইরূপই করিয়া থাকেন। পরের সাহিত্যে যাহা জ্ঞাতব্য থাকে তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উহা অধ্যয়ন করেন। পরের সাহিত্যে সুলেখক হইবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করা, তাঁহারা অতিশয় বুদ্ধিহীনতার কার্য্য মনে করেন। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমানের অপেক্ষাও বুদ্ধিমান। আমরা ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী লিখিবার জন্য অথবা ইংরাজের অপেক্ষাও ভাল ইংরাজী লেখক বলিয়া প্রশংসিত হইবার জন্য প্রাণপাত করি, আর আমাদের

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করি ও মাতৃভাষায় দুই ছত্র লেখা ঘোর দুষ্কর্ম্ম মনে করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরের রচনা প্রণালীতে নৈপুণ্য লাভ করা বিশেষ গর্হিত কার্য্য নহে। জ্ঞান সংগ্রহার্থ পরের সাহিত্যের যে অনুশীলন করা যায়, তাহার ফল স্বরূপ পরের ভাষায় লিখিবার যতটুকু ক্ষমতা জন্মিয়া যায়, ততটুকু লাভ করা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসাদির অধ্যাপকতা করিতে হইবে, ইংরাজী রচনা প্রণালীতে গাঢ় প্রবেশের জন্য প্রাণপণ করা, তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু সাধারণতঃ একথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত ও অনুরাগ বশতঃ ইংরাজী রচনায় সিদ্ধ হইবার জন্য সদাই ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া থাকা, কোন বাঙ্গালীরই প্রশংসা বা গৌরবের কথা নহে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব পরিত্যক্ত হইলে, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে এবং ইংরাজের ন্যায় বাঙ্গালা না লিখিয়া, আমরা বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালা লিখিবার উপযোগী হইব।

আরও একটী কথা আছে। ইংরাজী রচনায় সুনিপুণ এমন যে সকল বাঙ্গালী মহোদয়দিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালাই লিখিতেন। তাঁহাদের বিলাতী বাঙ্গালা লিখিবার কথাও বটে। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী না লিখিযা বাঙ্গালা লিখিতেন এবং আপনাদের ইংবাজীশিক্ষালব্ধ জ্ঞান স্বদেশীয়-দিগকে দিবাব নিমিত্ত আগ্রহ সহকারেই উহা লিখিতেন, ইহা যথার্থই তাঁহাদিগেব প্রশংসা ও গৌরবেব কথা। কিন্তু এখন যাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালা লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সেই মহাত্মা দিগের ন্যায ইংরাজী বিদ্যাও নাই, ইংরাজী লিপিকুশলতাও নাই। পূর্ব্বের মহাত্মাগণ যে কারণে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিতেন, ইঁহারা সে কারণে লেখেন না। তাঁহাদের অপেক্ষা ইহাঁদের চিত্তের দুর্ব্বলতা অনেক বেশী এবং স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধনেচ্ছা অনেক কম বলিযা, ইহাঁরা বিলাতী বাঙ্গালা লেখেন। অনেকে তাঁহাদিগকে বেশী বিলাতী ভাবাপন্ন আর ইহাঁদিগকে বেশী দেশী ভাবাপন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত

কথা তাহা নহে। তুলনায় তাঁহারাই ছিলেন বেশী দেশী ভাবাপন্ন, ইহাঁরাই বেশী বিলাতী ভাবাপন্ন। তাঁহাদের সারবত্তা বেশী ছিল, ইঁহাদের সারবত্তা কম হইযাছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকৃতি দৃষ্টে আমাদিগকে এই ভযাবহ সিদ্ধান্ত করিতে হইযাছে। মনুষ্যত্ব ও মানসিক সারবত্তা বৃদ্ধি করা সহজ কার্জ নয়। অটল প্রতিজ্ঞায, অসংখ্য উপাযে, অশেষ প্রযাসে উহা বৃদ্ধি করিতে হয়। বিলাতী বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে দেশীয বাঙ্গালা লিখিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিতে পারিলে, মনুষ্যত্ব ও মানসিক সারবত্তা বৃদ্ধি করিবার একটী উপায আমাদের আযত্ত হইবে। আমাদের ভাষা বিশুদ্ধ করিব, প্রথমে এই অভিপ্রাযে উহাতে যে ইংরাজীর দাগ লাগিতেছে, তাহা মুছিতে আরম্ভ করিতে হইবে। মুছিতে মুছিতে কেবল যে আমাদের ভাষা পরিষ্কার হইবে তাহা নহে, আমাদের মনও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, আমাদের মতি গতি প্রবৃত্তিও দিন দিন মনুষ্যত্বলাভের অধিকতর অনুকূল হইয়া পড়িবে। মনের সংস্কারে মনুষ্যত্ব। ইংরাজী শিক্ষার ফলে অখাদ্য খাইবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা

পরিত্যাগ করা যেমন কর্ত্তব্য, এবং তাহার পরাজয়ে যেমন মনুষ্যত্ব লাভ হয়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা পবিত্যাগ করাও তেমনই কর্ত্তব্য এবং তাহার পরাজযেও তেমনই মনুষ্যত্ব লাভ হয়। বিলাতী বাঙ্গালার বিলোপ করিযা আমাদের মাতৃভাষার বিশুদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলে, আমাদের মাতৃভাষাও আমাদিগকে মানুষ করিযা দিবেন। বিলাতী বাঙ্গালাব বিলোপ কবাও বড় কঠিন নহে। কি প্রণালীতে উহাব বিলোপ করিতে পারা যায়, পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

কেহ কেহ বলেন যে বিলাতী বাঙ্গালা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। তাঁহাদের মতে, উহাব ব্যবহারে দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যাঁহারা এই রূপ বাঙ্গালার ব্যবহার করেন, তাঁহারা আপন ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেন, এরূপ বোধ হয না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অধিক ইংরাজী শিক্ষার ফল স্বরূপ, কেহ বা ইংরাজীর প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব বশতঃ,

এই রূপ বাঙ্গালার ব্যবহার করেন। যাঁহারা পক্ষপাতিত্বে এই কাজ করেন, তাঁহারা যে অতি গর্হিতাচারী, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকাব করিবেন। তাঁহাদের আচবণ, কাহারই অনুকবণীয নহে। যাঁহাবা শুদ্ধ ইংবাজী অনুশীলনের ফলে এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া ফেলেন, কিন্তু এরূপ বাঙ্গালা ভাল এমন কথা বলেন না, তাঁহাবাও কাহাবও অনুকরণীয নহেন। যাঁহাবা ইংবাজী জানেন না, ইংবাজী শিক্ষিতদিগের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ কবিয়া তাঁহাদেব যত উপকৃত হইবাব কথা, যাঁহাবা ইংরাজী জানেন তাঁহাদেব তত উপকার হইতে পারে না। কাবণ সে সাহিত্যে যাহা থাকে, ইংবাজী শিক্ষিতেবা তাহার অধিকাংশ ইংবাজাতেই পাইযা থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ইংবাজী জানেন না, তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালা বুঝিতে পাবেন না। সুতবাং বিলাতী বাঙ্গালাব ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির হ্রাস না হইযা বৃদ্ধি হয, বোধ হয ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কাব আর হইতে পারে না। আর যে প্রকাব বাঙ্গালায আমাদের সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদাযিকতা সংঘটিত কবিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা

ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, বোধ হয় ইহার অপেক্ষা বিচিত্র কথাও আর হইতে পারে না। যদি কাহারও এরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, বিলাতী বাঙ্গালার ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, বাঙ্গালা ভাষার শক্তিসমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য বিদেশীয় ভাষার সাহায্য লইবার অগ্রে, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য লওযাই বাঙ্গালীর উপযুক্ত কাজ। বিলাতী বাঙ্গালায় যে সকল উদাহরণ দিযাছি তন্মধ্যে এমন একটীও নাই যাহার অর্থ দেশী বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। দেশী ধরণে অর্থ প্রকাশ করিতে পারা সম্ভব হইলে, বিলাতী ধরণে অর্থ প্রকাশ করা কোন বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেই যে শক্তি নিহিত আছে, অকারণে বিলাতী বাঙ্গালা লিখিলে তাহার বিকাশের ব্যাঘাত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে এবং বাঙ্গালী লেখকের আত্মমর্য্যাদাবোধ ও স্বদেশপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে অতি হেয ও আত্মশক্তি বিকাশের বিষম প্রতিকূল পরানুকরণপ্রিয়তাই প্রকাশ পাইবে।

পণ্ডিত-শ্রেণীর অনেক লোকে এখনও বাঙ্গালা লিখিতেছেন। তাঁহারা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহাও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কয়টি লক্ষণের আলোচনা করিলাম, তাঁহাদের লেখায় তন্মধ্যে দুইটী একবারেই দৃষ্ট হয না। তাঁহারা গ্রাম্যতাদির প্রযোগ করেন না, তাঁহারা বিলাতী বাঙ্গালাও লেখেন না। তৃতীয লক্ষণ প্রাদেশিকতাও তাঁহাদের লেখায অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায। এই কযটী লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদেব রচিত সাহিত্যাংশ যথার্থই অতি বিশুদ্ধ, জাতীয় ভাবাপন্ন ও আদর্শ-বৎ। কিন্তু তাঁহাদেব লেখাব একটী গুরুতব দোষ আছে। বৃহৎ-বৃহৎ অথবা অতি অপ্রচলিত অথবা উভযবিধ সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারের জন্য তাঁহাদেব লিখিত বাঙ্গালা শুধু যে সাধাবণ বাঙ্গালী পাঠকের দুর্বোধ হয তাহা নহে, অনেক বিদ্বানের নিকটেও দুরূহ হইযা থাকে। এরূপ লেখা অতি অল্প লোকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। এরূপ লেখাদ্বারা লোক সাধারণকে শিক্ষিত করিতে

পারা বড় কঠিন। সুতরাং এরূপ লেখা প্রকৃত সাহিত্য বলিযা গণ্য হইবাব যোগ্য নহে। বিলাতী বাঙ্গালাব ন্যায় একপ লেখাও সাম্প্রদাযিক লেখা। তবে পরানুকরণপ্রিযতায এ লেখাব উৎপত্তি নহে বলিযা, বিলাতী বাঙ্গালা যেমন দূষণীয এবং বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব অনিষ্টকর, ইহা তেমন নহে। বড়ই দুঃখের বিষয, পণ্ডিত শ্রেণীর লোক ও লেখকেরা এই রূপ লেখার বিষম পক্ষপাতী। এক ব্যক্তি ছোট ছোট বালকদেব উপযোগী সহজ ও সবল ভাষায একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণযন করিযা, কলিকাতার একটী প্রধান বিদ্যালযে উহা প্রবর্ত্তিত কবাইবাব প্রযাসী হইযাছিলেন। কিন্তু বিদ্যালযের পণ্ডিত মহাশযেবা পুস্তকখানি প্রবর্ত্তিত না কবিতে পাবিবাব এই হেতু নির্দ্দেশ কবিযা ছিলেন যে, উহাব ভাষা এত সহজ ও সবল যে উহা পাঠ করিযা বালকদিগেব শব্দ শিক্ষা একেবাবেই হইবেনা, এমন কি, উহা আযত্ত কবিবাব জন্য তাহাদিগকে কখন অভিধান খুলিতে হইবে না। এই শ্রেণীর লেখকেবা অতিশয শাব্দিকতাপ্রিয। বোধ হয় তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার

যে, শাব্দিকতাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ। সন্ধি সমাসাদির সাহায্যে তাঁহারা অনুচ্চার্য্য ও অপরিমিত দৈর্ঘ্যসম্পন্ন শব্দ বচনা করিযা, তদ্দ্বারা তাঁহাদের গ্রন্থাদি লোকসাধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অপাঠ্য করিযা ফেলেন। তাঁহাবা যে শ্রেণীস্থ সে শ্রেণীর লোকেব চিরন্তন সংস্কার এই যে,অধ্যযন কার্য্য লোক সাধারণেব নহে, শ্রেণী বিশেষেব। যাঁহাদেব এই রূপ সংস্কাব, গ্রন্থাদি লিখিবাব সময লোক সাধারণের উপযোগী করিযা লিখিবার আবশ্যকতাব কথা তাঁহাদেব মনে উদিত না হওযাই সম্ভব। বহুকালের সংস্কাব শীঘ্র ও সহজে পবিত্যাগ করা যায না। তাঁহাদেব বিশেষ দোষ নাই। কিন্তু অধ্যয়ন বা বিদ্যাশিক্ষা এখন পূর্ব্বেব ন্যায় শ্রেণী বিশেষেব মধ্যে আবদ্ধ না থাকিযা, সকল শ্রেণীব মধ্যেই চলিতেছে, ইহা তাঁহাবা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং লোক সাধারণের হিতাহিতেব প্রতি দৃষ্টি বাখিযা গ্রন্থাদি লেখা আবশ্যক হইযাছে, ইহা তাঁহাদেরও বিবেচনা করা উচিত। বড় আহ্লাদের বিষয, তাঁহারা ইহা বুঝিতেছেন এবং ক্রমে আরও বুঝিবেন। প্রথমেই বলিয়াছি. তাঁহারা অনেক স্থলে নব্যদিগের

সহিত মিত্রতা করিযা নব্যদিগের কোন কোন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয জ্ঞান করিতে-ছেন। ভারনা পণ্ডিতেতর শ্রেণীব লেখক দিগের সম্বন্ধে। তাঁহাবা পণ্ডিত শ্রেণীর লেখক দিগের ন্যায কোন পুরাতন বদ্ধমূল সংস্কারে আবদ্ধ নহেন। অথচ তাঁহাবাই সাহিত্যে নূতন নূতন সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদাযিকতাব সৃষ্টি করিতেছেন এবং লোক সাধাবণের হিতাহিতের প্রতি ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব মর্য্যাদাব প্রতি অধিকতব অমনোযোগী হইতেছেন। পণ্ডিতশ্রেণীব লেখকদিগের রচনায স্বেচ্ছাচারিতার লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদেব রচনা স্বেচ্ছাচাবিতা দোষে অতিশয দুষ্ট। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হওযায, তাঁহাদেব সম্বন্ধে আমার মনে কিঞ্চিৎ আশাব সঞ্চাব হইয়াছে। পরিষৎ স্থাপন পক্ষে পণ্ডিত শ্রেণীব লেখকদিগেব অপেক্ষা তাঁহাদেরই আযাস ও আগ্রহ অধিক। অতএব আশা হয যে, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনার্থ পরিষৎ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে প্রকার সংস্কার ও

উন্নতির আবশ্যকতার কথা এই প্রবন্ধে কহিলাম. তাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইযা পরিষদেব সার্থকতা সাধন কবিবেন।